বাটালবী এবং চকড়ালবীর বিতর্কের পর্যালোচনা

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা

বাটালবী এবং চকড়ালবীর বিতর্কের পর্যালোচনা

লেখক	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
ভাষান্তর	ঃ	জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান
প্রথম সংস্করণ	ঃ	নভেম্বর, ২০১৯ (বাংলা)
সংখ্যা	ঃ	১০০০
প্রকাশক	ঃ	নাজারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	:	Batalabi ebong Chakralabir bitorker porjalochona
Author	:	Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad[as]
Translator	:	Jahirul Hassan, Incharge, Bangla Desk, Qadian
1st Edition	:	November, 2019 (Bengali)
Copies	:	1000
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

উপক্রমণিকা

"**রিভিউ বর মোবাহিসা বাটালবী ও চকড়ালবী**" শিরোনামে পুস্তিকাটি সৈয়্যদনা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহদী (আ.)১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ '**বাটালবী এবং চকড়ালবীর বিতর্কের পর্যালোচনা**' শিরোনামে প্রকাশ পাচ্ছে। পুস্তিকাটির অনুবাদ উর্দু থেকে করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। এবং কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা । আরবী সহ সম্পূর্ণ সেটিং এর দায়িত্ব পালন করেছেন মোকাররম কাজী আয়াজ মহম্মদ সাহেব, মোয়াল্লিম সিলসিলা। পুস্তিকাটির পর্যবেক্ষণ, প্রুফ রিডিং এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন মোকাররম আবুতাহের মণ্ডল সাহেব (সদর রিভিউ কমিটি) এবং মোকাররম শেখ মহম্মদ আলী সাহেব (সদর এশায়া'ত কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ) এবং মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামিস (আইঃ) এর অনুমোদনে প্রথমবার পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রকাশ হচ্ছে।

পুস্তিকাটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্‌তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রণ সর্বদিক থেকে কল্যাণময় করুন।

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

নভেম্বর, ২০১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

বাটালবী এবং চকড়ালবীর বিতর্কের পর্যালোচনা

মৌলবী আবু সঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী এবং মৌলবী আবদুল্লাহ্ সাহেব চকড়ালবীর মোবাহিসার উপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাকাম রব্বানীর পর্যালোচনা এবং নিজ জামাতের জন্য একটি উপদেশ

উভয়পক্ষের রচনা দ্বারা জানা গেল যে উক্ত বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা এই কারণে হয়েছিল যে, মৌলবী আবদুল্লাহ্ সাহেব আহাদীস নববীকে একেবারে পরিত্যক্ত খেয়াল করেন এবং এমন কদর্য ভাষা ব্যবহার করেন যার উচ্চারণ করাও নৈতিকতা বিরুদ্ধ। এর বিপরীতে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে, যদি আহাদীস পারতপক্ষে এমনই পরিত্যক্ত ও অবিশ্বাস্য হয় তবে ইবাদত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের বহু অংশ বাতিল বলে পরিগণিত হবে। কেননা, কোরআনীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যা হাদীস হতেই অবগত হওয়া সম্ভব। নয়ত শুধুমাত্র কোরআনকেই যদি যথেষ্ট মনে করা হয় সেক্ষেত্রে কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে একথার কি প্রমাণ আছে যে,

আবশ্যিক নামাজগুলি- ফজরের দুই রাকাত, আর মগরিবের তিন এবং অবশিষ্ট তিন নামাজ চার চার রাকাতের? এ আপত্তিটি স্ববিরোধী হলেও কিন্তু শক্তিশালী। এই কারণেই মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব এই আপত্তির কোন সদর্থক উত্তর দিতে পারেননি। শুধু অনর্থক কথা বলেছেন, যা লেখা সমীচীন নয়। হ্যাঁ এই বিরোধীতার ফল শেষ পর্যন্ত এটাই দাঁড়িয়েছিল যে মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে একটা নতুন প্রকারের নামাজ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সমুদয় ইসলামি ফেরকার মধ্যে যার নাম ও নিশান পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি আত্যাহিয়্যাতু এবং দরূদশরীফ এবং অন্যান্য নির্ধারিত দোয়াসমূহ যেগুলি নামাজে পড়তে হয় সেগুলি বিলুপ্ত করে তার স্থানে শুধু কোরআনের আয়াত রেখে দেন। এরকম আরও অনেক স্থানে নামাজের মধ্যে তিনি পরিবর্তন ঘটান যার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন নেই। আর হয়ত হজ্জ এবং যাকাত ইত্যাদির মতো বিষয়েও পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু এটা কি সঠিক মৌলবী সাহেব যেমনটা মনে করছেন যে হাদীসগুলি সত্যিই বেকার এবং নিরর্থক? নাঊযুবিল্লাহ্। তা কখনই নয়।

মোদ্দা কথা হল এটাই যে এই উভয়পক্ষের মধ্য হতে একপক্ষ চরমপন্থার পথ অবলম্বন করেছে আর অপর পক্ষটি বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা প্রদান করে গেছে মাত্র। প্রথম পক্ষ অর্থাৎ মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব যদিও এ কথায় সঠিক যে, আহাদীস নববী মরফুআ মোত্তাসিলা (সে সব হাদীস মধ্যবর্তী কোন বিমোচন ছাড়াই ধারাবাহিকভাবে তার বর্ণনাকারীকে পেয়েছে।

এবং যে সব হাদীসের সনদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন- অনুবাদক) এমন নয় যেগুলিকে বেকার এবং নিরর্থক মনে করা হবে কিন্তু তিনি মর্যাদা সংরক্ষণের নিয়ম নীতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে আহাদীসের মর্যাদা এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যার ফলে কোরআন শরীফের অমর্যাদা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। আর তাকে অস্বীকার করতে হয়। আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরোধীতা এবং সম্মানহানির সে কোনও ভ্রুক্ষেপ করে না এবং হাদীসে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে কোরআন করীমে বর্ণিত প্রমাণিত ঘটনাবলীর উপর অগ্রগণ্য খেয়াল করে। আর প্রতিটা ক্ষেত্রে হাদিসের বর্ণনাকে আল্লাহ্‌র কালাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। যা একেবারে ভ্রান্ত এবং ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ। আল্লাহ্‌তাআলা কোরআন শরীফে বলেছেন-

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ

অনুবাদ : 'অতএব তাহারা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার নিদর্শনাবলীর (অস্বীকার করার) পরে কোন্ কথার উপর ঈমান আনিবে? (আল্ জাশিয়া, **45:7**)

এখানে হাদীস শব্দটি থেকে ন্যূনতম যে লাভ পাওয়া যায় তা স্পষ্ট বলছে যে, যে হাদীসগুলি কোরআনের বিরোধী এবং বিবাদ সৃষ্টিকারী আর উপায় নিষ্পেষণের কোন পথ দেখায় না সেগুলো বাতিল করো। আর এই হাদীসে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত যা এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। আর তা হল খোদাতাআলা উক্ত আয়াতে এই বিষয়ের

প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এই উম্মতের উপর এমন একটা যুগ আসতে চলেছে যখন উম্মতের কিছু লোক কোরআন শরীফকে পরিত্যাগ করে এমন হাদীসের উপর আমল করা শুরু করবে যার বর্ণনাকৃত বক্তব্য পবিত্র কোরআন এর অনুশাসন বিরোধী এবং বিবাদ সৃষ্টিকারী হবে। ফলস্বরূপ এই আহলে হাদীস ফির্কাটি এ কথায় খুব জোর দিয়ে কোরআনের সাক্ষ্যের উপর হাদীসের বর্ণনাকে তারা প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছে। যদি তারা ন্যায় এবং খোদা ভীরুতার সাথে কাজ করত তাহলে এমন হাদীস গুলির গ্রহণযোগ্যতা তারা কোরআন শরীফের নিরিখে তুলনা করতে পারত। কিন্তু তারা খোদাতাআলার অটল এবং নিশ্চিত বাণীকে (বাক্যাবলীকে) পরিত্যাগ করতে সহমত পোষণ করে এবং পৃথক করে দেয়। আর তারা এ কথায় রাজি হয়নি যে, এমন হাদীস যার বর্ণনা খোদাতাআলার কিতাবের বিরোধী সেগুলোকে পরিত্যাগ করে অথবা আল্লাহ্‌তাআলার কিতাবের সঙ্গে সেগুলির পর্যালোচনা করে। সুতরাং এই ছিল সেই কট্টরপন্থা যা মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন অবলম্বন করেছিল। আর তার বিরোধী মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব চুড়ান্ত শিথিলতার পথ অবলম্বন করে হাদীসকেই অস্বীকার করে বসেছে। হাদীসকে অস্বীকার করা এক প্রকার কোরআনকেই অস্বীকার করা হয়। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলা কোরআন করীমে বলেছেন,-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ

অনুবাদ:- তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। (আলে ইমরান- **3:32**)

সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসা যখন আঁ হযরত (সা.) এর প্রকৃত অনুসরণের মাঝে নিহিত আর তাঁর ব্যবহারিক আদর্শগুলিকে জানা ও অনুসরণের জন্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয় তন্মধ্যে হাদীসও একটি। তাই যে ব্যক্তি হাদীসকে ত্যাগ করে, সে প্রকৃতপক্ষে অনুসরণের পথকেও পরিত্যাগ করে। আর মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ সাহেবের এ কথা বলা যে সমস্ত হাদীসগুলি কেবলমাত্র সন্দেহ এবং কল্পনার এক আধার মাত্র- এটি চিন্তা ভাবনার পর্যাপ্ত অভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এই চিন্তা ধারার মূল কারণ হাদীস বিশারদ মোহাদ্দেসীনদের একটি ভুল এবং অসম্পূর্ণ বিভাজনও বটে যা বহু লোককে প্রতারিত করেছে। কেননা তারা এভাবে বিভাজন করেছে যে, আমাদের হাতে এক তো আল্লাহ্‌ তাআলার কিতাব আছে। আর অপরটি হল হাদীস, এবং হাদীস খোদাতাআলার কিতাবের উপর কাজীর মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ হাদীসগুলি এক কাজী অথবা বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত আর কোরআন তার সামনে বিচারপ্রার্থী রূপে দণ্ডায়মান। আর হাদীসের আদেশের অধীন। এরকম বর্ণনায় নিঃসন্দেহে সবাই ধোকা খেয়ে যাবে কেননা হাদীসগুলি আঁ হযরত (সা.)-র একশ দেড়শ বছর পরে সংগৃহীত হয়েছে আর সেগুলি মানবীয় হাতের স্পর্শ থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া সেগুলি বর্ণনাকারীর সংকলন এবং কল্পনা নির্ভর।

এছাড়া এগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রক্ষাকারী হাদীসের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর সেই-ই যদি আবার কোরআন করীমের উপর বিচারক নিযুক্ত হয় সেক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হবে যে, সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্ম কল্পনার এক ভাণ্ডার মাত্র। আর বাহ্যত কল্পনা কোন জিনিসই নয়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্পনাতেই থাবা বসায় সে ভাবনা চিন্তার শিখর হতে পতিত। আল্লাহ্তাআলা বলেন :

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ط

অনুবাদ: নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না। **(ইউনুস, 10:37)**

অর্থাৎ অটল বিশ্বাসের সম্মুখে কল্পনা কিছুই নয়। সেক্ষেত্রে কোরআন শরীফ তো হস্তচ্যুত হলই। কেননা, কাজী সাহেবের ফতওয়া ছাড়া তা আমল যোগ্য হবে না অতএব তা পরিত্যক্ত এবং মিথ্যা। অপরদিকে কাজী সাহেব অর্থাৎ আহাদীস কেবলমাত্র কল্পনার নোংরা ধূলি ধূসরিত বস্ত্র পরিধান করে আছে। যার দ্বারা মিথ্যার সমূহ সম্ভাবনা কোনও মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা কল্পনার পরিভাষাই হল যা মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়। এমতবস্থায় না কোরআন আমাদের হাতে রইল আর না হাদীস তাহলে কার উপর ভরসা করা যেতে পারে। অর্থাৎ হাত থেকে দুটোই গেল। এই ভুলটিই অধিকাংশ লোককে ধ্বংস করেছে।*আর সিরাতল মুস্তাকিম (সরল সুদৃঢ় পথ) যা প্রকাশ

করার জন্য আমি এ নিবন্ধ লিখেছি তা হল ইসলামি অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য মুসলমানদের হাতে তিনটি জিনিস বিদ্যমান:-

(১) পবিত্র কোরআন যা আল্লাহ্‌তাআলার গ্রন্থ- ইহা অপেক্ষা পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কিছু নেই। এটা আল্লাহ্ তা'লারই বাণী এবং সব ধরণের সন্দেহ এবং কল্পনার সংমিশ্রণ হতে পবিত্র।

(২) সুন্নত - এখানে আমরা আহলে হাদীসের পরিভাষা

** নোট:- যখন আমি বিজ্ঞাপনটি সমাপ্ত করি হয়ত দুই-তিন লাইন অবশিষ্ট ছিল, স্বপ্ন আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে যে, বাধ্য হয়ে কাজে বিরতি দিয়ে শুয়ে পড়ি। তখন মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী এবং মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব চকড়ালবী সম্মুখে ভেসে ওঠে। আমি দুজনকে সম্বোধন করে বলি:-*

خسف القمر والشمس فی رمضان- فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ

অর্থাৎ চন্দ্র এবং সূর্যের গ্রহণ রমজান মাসে সংগঠিত হয়েই গেছে। অতএব হে দুই সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব! আপনারা খোদা তা'লার নেয়ামত (পুরস্কার)-কে কেন মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। পুনরায় স্বপ্নে আমি ভ্রাতৃসম মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবকে বলি যে, اٰلَآء বলতে এখানে আমাকে বোঝান হয়েছে। এরপর একটি দালানের দিকে তাকাই। দেখি যে সেখানে বাতি প্রজ্জ্বলিত রয়েছে অর্থাৎ রাতের সময়। এবং উপরোক্ত ইলহামটিকে কিছু লোক বাতির সম্মুখে পবিত্র কোরআন থেকে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। যেন এভাবেই পবিত্র কোরআনে তা বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে আমি সনাক্ত করি যে তিনি মিয়াঁ নবী বক্স সাহেব রফুগর অমৃতসরী ।

থেকে আলাদা হয়ে কথা বলব। অর্থাৎ আমরা হাদীস এবং সুন্নতকে এক জিনিস মনে করি না। যেমনটা তথাকথিত মোহাদ্দেসীনরা করে থাকে। বরং হাদীস আলাদা জিনিস আর সুন্নত আলাদা জিনিস। সুন্নত বলতে আমরা আঁ হযরত (সা.)-র ব্যবহারিক আচরণ বুঝি যা নিজ মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখে আর প্রথম থেকেই পবিত্র কোরআনের সাথে প্রকট হয়েছে। আর সর্বদা সাথেই থাকবে। অথবা অন্য শব্দে বলতে পারেন পবিত্র কোরআন হল আল্লাহ্‌তা'লার বাণী আর সুন্নত হল আঁ হযরত (সা.)-র কর্ম। অতীত থেকেই খোদা তা'লার চিরাচরিত নিয়ম এটাই যে যখন নবীগণ খোদা তা'লার বাণী নিয়ে মানুষের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে আগমন করে তখন আপন কার্য দ্বারা অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য দ্বারা উক্ত বাণীটির ব্যাখ্যা প্রদান তারা করে থাকে। যাতে বাণীটির অনুধাবন জনগণের উপর সন্দেহজনক না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য বাণীটির উপর স্বয়ং আমল করে এবং অন্যদেরকেও আমল করায়।

(৩) হেদায়ত লাভের তৃতীয় মাধ্যম হচ্ছে হাদীস। হাদীস বলতে আমরা সেই সব চিহ্নাবলীকে বোঝাতে চাই যা ঘটনাক্রমে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রায় দেড়শ বছর পরে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। তাই সুন্নত এবং হাদীসের মধ্যে পরম্পরাগত পার্থক্য হচ্ছে এটাই যে, সুন্নত একটি কর্ম পদ্ধতি যা নিজের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, যা আঁ হযরত (সা.) আপন হাতেই শুরু করেছিলেন এবং শ্রেণীগত দিক থেকে নিশ্চিতরূপে তা পবিত্র কোরআনের পরে দ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত।

আর যেভাবে আঁ হযরত (সা.) পবিত্র কোরআনের প্রসারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন অনুরূপভাবে সুন্নত প্রতিষ্ঠার নিমিত্তেও তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং পবিত্র কোরআন যেভাবে বিশ্বাসযোগ্য, একইরকমভাবে নিত্য এবং নিরন্তরতাপূর্ণ সুন্নতের উপর বিশ্বাস রাখা ও আবশ্যক। এই দুটি সেবা আঁ হযরত (সা.) স্বহস্তে সম্পাদন করেছেন এবং এগুলোকে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ যখন নামাজের নির্দেশ অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহ্‌তা'লার এই নির্দেশকে আঁ হযরত (সা.) আপন ব্যবহারিক কর্মের দ্বারা পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন। আর কার্যত তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেমন ফজরের নামাজে এতগুলি রাকাত, আর মগরিবের এতগুলি এবং অন্যান্য সব নামাজগুলির জন্য এতগুলি রাকাত ইত্যাদি। একই রকমভাবে হজ্জ করেও দেখিয়েছেন। এবং নিজের হাতে হাজার হাজার সাহাবাকে এ কাজে আবদ্ধ করে কার্য সম্পাদনের ধারাবাহিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত যা এখনও অবধি উম্মতের মধ্যে আমল রূপে স্বীকৃত এবং অনুভূত হয়ে আসছে - সেটাই সুন্নত। কিন্তু হাদীসকে আঁ হযরত (সা.) আপন সম্মুখে কখনও লিপিবদ্ধ করাননি আর না তাকে সংগৃহীত করার কোনও প্রয়াস করেছেন। কিছু হাদীস হযরত আবু বকর (রা.) একত্রিত করেছিলেন কিন্তু খোদা তা'লার ভয়ে ভীত হয়ে যে হাদীসগুলি সরাসরি আমি শুনিনি আর প্রকৃত সত্য সম্পর্কে একমাত্র খোদা তা'লাই অবগত পরবর্ত্তীতে সেসব হাদীসগুলি তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; অত:পর সাহাবাদের যুগ যখন সমাপ্ত হল তখন

কিছু **তাবা তাবেঈন**দের হৃদয়কে আল্লাহ্‌তা'লা এদিকে নিবদ্ধ করলেন যে, হাদীসগুলিকেও সংগৃহীত রাখা দরকার। তখন হাদীসগুলিকে একত্রিত করা হল। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে বেশির ভাগই হাদীসের সংগ্রহকারী খুবই তাকওয়া পরায়ণ এবং পবিত্রচেতা ছিলেন। তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী হাদীসগুলিকে নিরীক্ষণ করেছেন এবং সেই সব হাদীস থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন যা তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা ছিল। আর প্রত্যেক সন্দেহজনক পরিস্থিতি সম্পন্ন বর্ণনাকারীর হাদীস তারা গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। খুবই পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু যেহেতু সমস্ত প্রক্রিয়াটিই পরবর্ত্তী সময়ে সংগঠিত এজন্য এ সব কিছুই কল্পনার স্তর পর্যন্ত সীমিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এটা বলা যে, সব হাদীসগুলিই ব্যর্থ, বেকার, অপ্রয়োজনীয় এবং মিথ্যা-ভারি অন্যায় হবে। বরং সেসব হাদীসগুলি সংকলনের সময় এতটাই সতর্কতার সাথে কাজ করা হয়েছিল এবং এতটাই তথ্যানুসন্ধান ও নিরীক্ষণ করা হয়েছিল যার দৃষ্টান্ত অপর কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। ইহুদীদের মধ্যেও হাদীস বিদ্যমান। আর হযরত মসীহ্‌-র বিরোধীতায় ইহুদীদের সেই ফেরকাই ছিল যারা আমিল বিল হাদীস (অর্থাৎ হাদীসের উপর আমলকারী- অনুবাদক) বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু এটা প্রমাণ করা যায়নি যে, ইহুদীদের মোহাদ্দেসীনরা এমন সতর্কতার সহিত হাদীসগুলিকে একত্রিত করেছিলেন, যেমনটা ইসলামের মোহাদ্দেসীনরা করে গেছেন। তথাপি এমন ধারণা পোষণ করাও অন্যায় হবে যে, যতদিন

পর্যন্ত হাদীস সংগৃহীত হয়নি ততদিন পর্যন্ত লোক নামাজের রাকাত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল অথবা হজ্জের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। কেননা সুন্নতের মাধ্যমে ধারাবাহিক আমলের যে অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তা ইসলামের সমস্ত বিধি-নিষেধ এবং অনুশাসন তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিল। তাই একথা একেবারেই সত্য যে যদি এসব হাদীসগুলির বাস্তবিক কোনও অস্তিত্বই পৃথিবীতে না থাকত, যা এক দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সংগৃহীত হয়েছিল তথাপিও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় এর কোনও প্রভাব পড়ত না । কেননা, কোরআন এবং ধারাবাহিক আমল সেই প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছিল। তথাপি হাদীস সেই জ্যোতিকে আরও বেশি প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছিল। অর্থাৎ ইসলাম **'নূর আলা নূর'** (জ্যোতির উপর জ্যোতি) হয়ে গিয়েছিল। আর কোরআন এবং সুন্নতের জন্য হাদীস সাক্ষ্য হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিল। পরবর্ত্তীতে ইসলামের মধ্যে অনেক ফেরকার সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে সত্য ফেরকাগুলির সঠিক আহাদীস থেকে প্রভূত লাভ হয়। সুতরাং ইসলাম ধর্ম হল এটাই, না এ যুগের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মতো হাদীসের প্রতি এ আস্থা পোষণ করা যে, তা কোরআন-এর উপর অগ্রগণ্য আর তার বর্ণনা কোরআনের বর্ণনার বিপক্ষে গেলে হাদীসের বর্ণনাগুলিকে কোরআনের উপর প্রাধান্য দিয়ে কোরআনকে পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করা। আর না হাদীসগুলিকে মৌলবী আব্দুল্লাহ্ চকড়ালবীর বিশ্বাস অনুযায়ী নিরর্থক এবং বাতিল সাব্যস্ত করা। বরং কোরআন এবং সুন্নতকে হাদীসের উপর বিচারক মনে করা উচিত এবং

যে হাদীসগুলি কোরআন এবং সুন্নতের সপক্ষে সেগুলোকে সাদরে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এটাই হল সীরাতে মুস্তাকীম। ধন্যবাদ তাদের যারা এই অনুশাসনকে মান্য করে। মূর্খ এবং দুর্ভাগ্যশালী * তারাই যারা এই নিয়মকে দৃষ্টিপটে না রেখে হাদীসগুলিকে অমান্য করে।

আমাদের জামাতের এটি আবশ্যিক কর্তব্য হওয়া উচিত যে যদি কোন হাদীস কোরআন এবং সুন্নত পরিপন্থী এবং বিরোধী না হয় সেক্ষেত্রে তা যত নিম্নমানেরই হোক না কেন তার উপর যেন আমল করা হয়। আর মানুষের তৈরী করা ফেকাহ্ (শাস্ত্রে)র উপর তাকে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর যদি হাদীসে কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকে, আর না সুন্নতে, আর না কোরআনে তার সাদৃশ্য পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে হানাফি ফেকাহ্র উপর যেন আমল করা হয়। কেননা এ ফেরকার সংখ্যাধিক্যতাই খোদা তা'লার সংকল্পের উপস্থাপন করে। আর যদি বর্তমান কিছু সংস্করণের কারণে ফিকাহ্ হানাফী সঠিক রায় দানে অসমর্থ হয় সেক্ষেত্রে এই সিলসিলার উলেমারা আপন আপন ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে কাজ করবেন। কিন্তু তারা সাবধান থাকবেন যেন মৌলবী আব্দুল্লাহ্

** নোট:- আজ রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে একটা ফলদার বৃক্ষ উত্তম এবং সুন্দর ফলে সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। এবং কিছু জামাত (লোক) কষ্ট এবং জোর করে একটা আগাছাকে তার উপর তুলে দিতে চাইছে।*

টীকা.....

চকড়ালবীর ন্যায় অকারণে হাদীসকে অস্বীকার করে না বসেন। হ্যাঁ যেখানে যেখানে কোরআন এবং সুন্নত পরিপন্থী কোন হাদীস দেখবেন সেগুলিকে ত্যাগ করবেন। স্মরণ রাখবেন যে আমাদের জামাত আব্দুল্লাহ্ অপেক্ষা আহলে হাদীসের বেশী

টিকার শেষাংশ:-

যার কোন মূল নেই, শুধুমাত্র তুলে ধরে রাখা হয়েছে। সেই আগাছাটি আফ্তেমুন (এক প্রকার আগাছা-অনুবাদক) সদৃশ। যেমন যেমন আগাছাটি বৃক্ষটির উপর উঠছে তার ফলগুলিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। আর সেই সুন্দর বৃক্ষটিতে এক প্রকার কদর্য রূপ সৃষ্টি হচ্ছে। আর যে ফলের আশা করা হচ্ছিল তা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বলা ভাল, কিছু ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তখন আমার হৃদয় এটা দেখে ঘাবড়ায় এবং বিগলিত হয়ে যায়। তখন আমি একজনকে যে পুণ্যবান ও পবিত্র মানুষ রূপে সেখানে দণ্ডায়মান ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এটা কি বৃক্ষ? আর এই আগাছাটির পরিচয় কি? যে এমন দৃষ্টিনন্দন একটা বৃক্ষকে আবর্তে ধরে রেখেছে। তখন সে উত্তরে আমাকে জানায় যে, এই বৃক্ষটি হল আল্লাহ্তা'লার বাণী কোরআন আর ওই আগাছাটি হল সেই সমস্ত আহাদীস এবং অন্যান্য উক্তিসমূহ যা কোরআনের পরিপন্থী অথবা যেগুলোকে বিরোধীতাকারী বলে মনে করা হয়। তাদের আধিপত্যই বৃক্ষটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে।

তখন আমার চোখ খুলে যায়। চোখ খোলা মাত্রই, এখন আসলে যা রাতের সময় আমি এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করছি। আর এখন যবনিকা টানলাম। এটা সোমবারের রাত আর সময় রাত বারোটার পর কুড়ি মিনিট কম দুটো। আলহামদুলিল্লাহ্ যালেক, মিম-গাঈন-আলিফ (মির্যা গোলাম আহ্মদ-অনুবাদক)

নিকটবর্তী এবং আব্দুল্লাহ্ চকড়ালবীর নিকৃষ্ট চিন্তা ভাবনার সাথে আমাদের কোনও সামঞ্জস্যতা নেই। প্রত্যেক এমন যারা আমাদের জামাতের সাথে সংযুক্ত আছে তাদের এটাই কর্তব্য যেন তারা আব্দুল্লাহ্ চকড়ালবীর বিশ্বাসের সাথে যা সে হাদীস সম্পর্কে রাখে আন্তরিকভাবে ঘৃণা পোষণকারী এবং বিমুখ হয়ে যায়। আর এমন লোকের সহাবস্থান থেকে সর্বদা দূরত্ব বজায় রাখে, কারণ, অন্যান্য বিরোধীতাকারী অপেক্ষা এরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ফেরকা। * আর মৌলবী মোহাম্মদ হোসেনের গোষ্ঠীর ন্যায় হাদীসের ব্যাপারে তারা যেন বাড়াবাড়ি না করে আর না আব্দুল্লাহর ন্যায় শৈথিল্য প্রদর্শনের দিকে তারা অবনত হয়। বরং এ ব্যাপারে তারা যেন মধ্যপন্থা অবলম্বনকে নিজেদের ধর্ম মনে করে। অর্থাৎ না তো এমন ভাবে হাদীসকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কাবা এবং কিবলা নিরূপণ করে যে, কোরআন পরিত্যক্ত এবং ভিন্ন কোন জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়। আর না হাদীসকে এরূপ বাতিল এবং নিরর্থক সাব্যস্ত করে যে, আহাদীস নববী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। একই রকম ভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর খতমে নবুয়তের যেন অস্বীকার না করে, আবার খতমে নবুয়তের এই অর্থও যেন না করে যাতে এই উম্মতের উপর ঐশী বার্তালাপের এবং ইলহামের পথ অবরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। স্মরণ রাখবেন আমাদের ঈমান হল শেষ কিতাব এবং সর্বশেষ শরিয়ত কোরআন, এটা যেন বিস্মৃত না হয়। এর পর কেয়ামত অবধি এই অর্থে কোন নবী নেই, যে শরীয়ত নিয়ে আসবে অথবা আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে সরাসরি ঐশী

(* পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাণী লাভ করবে।

কেয়ামত অবধি এ দ্বার অবরুদ্ধ আর নবী (সা.)-এর আনুগত্যে ওহীর পুরস্কার লাভের পথ কেয়ামত অবধি উন্মুক্ত। আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ হওয়া ওহী কখনও বন্ধ হবে না। কিন্তু শরয়িতধারী নবুয়ত অথবা স্থায়ী নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

ولا سبيل اليها الٰى يوم القيٰمة ومن قال انى لست من امة محمد صلى اللّٰه عليه وسلم وادعى انه نبى صاحب الشريعة اومن دون الشريعة وليس من الامّة فمثله كمثل رجل غمره السيلُ المنهمر فالقاه وراء ه ولم يغادر حتّى مات

এর ব্যাখ্যা হল খোদা তা'লা যেখানে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আঁ হযরত (সা.) হলেন খাতামুল আম্বিয়া, সেখানে এ ইঙ্গিতও

---

* *ঐ রাতেই একটি ইলহাম হয়। রাত তিনটে বেজে দুই মিনিটের সময়। ইলহামটি হল:*

مَن أَعرض عن ذكرى نبتليه بذريّة فاسقةٍ ملحدةٍ يميلون إلى الدّنيا ولا يعبد وننى شيئًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে তাকে আমরা অসৎ সন্তান দ্বারা বিভ্রান্ত করে তুলব। তাদের জীবন অধার্মিকদের ন্যায় হবে। তারা এ পৃথিবীতে পতিত হবে এবং আমার ইবাদতের সঙ্গে তাদের কোনওরূপ অংশ থাকবে না। অর্থাৎ এরকম সন্তানদের পরিণতি নিকৃষ্ট হবে আর অনুশোচনা এবং খোদাভীতির সৌভাগ্য তারা লাভ করবে না। (সন্নিহিত)

দিয়েছেন যে তিনি (সা.) তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সব সুলহাকারী (সংশোধনকারী)দের পক্ষে إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (আল কাওসার, **108:4**) এ করা হয়েছে। মোট কথা এই আয়াত পিতার ন্যায় যাদেরকে পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারা আত্মার পরিপূর্ণতা দান করা হয়ে থাকে। এবং ঐশী বাণী এবং বার্তালাপের পরম সৌভাগ্য তাদের প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমনটা সেই সর্ব শক্তিমান খোদাতা'লা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

(আল আহযাব, **33:41**)

অনুবাদ:- মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে। কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর।

এটি স্পষ্ট যে আরবী ভাষায় **'লাকিন'**, শব্দটি বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কথা রয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ করার জন্য। সেক্ষেত্রে এই আয়াতের প্রথম অংশে যে কথাটি রয়ে গেছিল বলে বলা হয়েছে অর্থাৎ যা আঁ হযরত (সা.)-এর অস্তিত্বের সঙ্গে অস্বীকার করা হয়েছিল তা শারীরিকভাবে কোন পুরুষের পিতা হওয়া ছিল। তাই আরবী (লাকিন) শব্দটি দ্বারা পরিসমাপ্তি হয়ে যাওয়া বিষয়টির এভাবে নিবারণ করা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে যার অর্থ এটাই দাঁড়ায়

যে, তাঁর (সা.) মাধ্যমে সরাসরি নবুয়ত লাভের আশিস পরিসমাপ্ত হয়েছে। আর এখন নবুয়তের বৈশিষ্ট্য সেই ব্যক্তিই লাভ করতে সক্ষম, যে তার কর্মের উপর আঁ হযরত (সা.)-এর আজ্ঞাপালন এবং অনুসরণের মোহর খোদিত রাখতে সক্ষম হবে। আর এরূপে সে আঁ হযরত (সা.)-এর সন্তান এবং তাঁর উত্তরাধিকারী গণ্য হবে। অর্থাৎ এই আয়াতে এক প্রকার আঁ হযরত (সা.)-এর পিতৃত্বের অস্বীকার করা হয়েছে আবার অপর দিকে পিতা হওয়াকে সাব্যস্তও করা হয়েছে। যাতে করে সেই আরোপকে দূর করা যায়, যার উল্লেখ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (সূরা কাওসার, **108:4**) এ করা হয়েছে। মোট কথা এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নবুয়ত সে শরীয়ত বিহীনই হোক না কেন তা এভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে, কোন ব্যক্তি সরাসরি আর এটি লাভ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু যে নবুয়ত মোহাম্মদী নবুয়তের প্রদীপ থেকে আলোক এবং আশিসপ্রাপ্ত সেই নবুয়ত বন্ধ হয়ে যায় নি। অর্থাৎ এরকম পূর্ণতা প্রাপ্ত যে, একদিকে তো উম্মতি হবে আবার অপরদিকে মোহাম্মদী জ্যোতি লাভ করার কারণে নবুয়তের উৎকর্ষতাও নিজ অন্তরে রাখবে। আর এভাবেও যদি উম্মতের পূণ্যাত্মা নেক লোকেদের পূর্ণ করতে অস্বীকার করা হয় সেক্ষেত্রে নাঊযুবিল্লাহ্ আঁ হযরত (সা.) দুই ভাবেই নিঃসন্তান সাব্যস্ত হবেন। জাগতিকভাবেও আর আধ্যাত্মিক ভাবেও। আর অপরদিকে বিরোধীতাকারীরা সত্যবাদী প্রতিপন্ন হবে, যারা আঁ হযরত (সা.)-কে আবতর (নিঃসন্তান) আখ্যায়িত করেছে।

এখন যখন একথা নিরূপণ হয়েই গেছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর পর স্থায়ী নবুয়ত যা সরাসরি লাভ হয়ে থাকে * তার দরজা কেয়ামত অবধি অবরুদ্ধ হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ উম্মতি হওয়ার বাস্তবিকতা নিজ অন্তরে না রাখবে এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনও অবস্থাতেই আঁ হযরত (সা.)-এর পরবর্ত্তীতে প্রকাশ হতে পারবে না। এমতাবস্থায় হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতরণ এবং তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলা যে সে উম্মতি এবং তাঁর নবুয়ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মোহাম্মদী নবুয়তের প্রদীপ থেকে অর্জিত ও আশিসপ্রাপ্ত কতটাই মিথ্যা এবং আড়ম্বরপূর্ণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই নবী আখ্যায়িত হয়েছে, তার সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে তার নবুয়ত আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের প্রদীপ থেকে উপকৃত। আর যদি তার নবুয়ত মোহাম্মদী প্রদীপ থেকে উপকৃত না হয় সে ক্ষেত্রে কোন অর্থে তাকে উম্মতি আখ্যায়িত করা হবে। আর এটি স্পষ্ট যে উম্মত শব্দটি কারো উপর তখনই সত্য প্রতিপন্ন হবে যতক্ষণ না সে তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য অনুসরণীয় নবীর মাধ্যমে লাভ না করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি নবী হওয়ার এত বড় বৈশিষ্ট্য স্বয়ং রাখে, সে উম্মতি কিভাবে হবে? বরং সে তো

---

* *কিছু অসম্পূর্ণ মোল্লা আমার উপর আপত্তি জানিয়ে বলে যে, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আমাদের এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, তোমাদের*

টীকা.....

স্থায়ী নবী গণ্য হবে। যার জন্য আঁ হযরত (সা.)-র পরবর্ত্তীতে অগ্রসর হওয়ার স্থান নেই। আর যদি বল যে তার প্রথম নবুয়ত যা সরাসরি ছিল তা দূর করা হবে এবং এখন (এই) নবীর আনুগত্যে সে নতুন করে নবুয়ত লাভ করবে যেমনটা আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই উম্মত যাকে শ্রেষ্ঠ উম্মত আখ্যায়িত করা হয় সে এই অধিকার রাখে যে, তার কোন সদস্য যেন নবী (সা.)-এর আনুগত্যের সৌজন্যে এই সম্ভাব্য মর্যাদা অবধি পৌঁছায়, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে পুনরাগমনের প্রয়োজন নেই। কেননা, মোহাম্মদী জ্যোতির পরিপূর্ণতার মাধ্যমে

টীকার পরবর্তী অংশ.....

মধ্যে ৩০ জন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। আর তারা প্রত্যেকে নবুয়তের দাবী করবে। এর জবাব হল, হে অজ্ঞেরা! দুর্ভাগারা! তোমাদের ভাগ্যে কেবল ত্রিশজন দাজ্জালই লিখিত ছিল। চৌদ্দ শতাব্দীর পঞ্চম ভাগও অতিক্রম হয়ে যেতে বসল আর খেলাফতের চন্দ্রমা তার পরিপূর্ণতার চতুর্দশ মঞ্জিল সম্পূর্ণ করে ফেলল যে দিকে আয়াত وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ *(সূরা ইয়াসীন, **36:40**) ও ইশারা করছে আর পৃথিবী সমাপ্ত হতে শুরু করেছে অথচ তোমাদের দাজ্জাল এখন ও নিঃশেষ হচ্ছে না। হয়ত তোমাদের মরণ অবধি তোমাদের সাথে থাকবে। হে মূর্খের দল! সেই দাজ্জাল যাকে শয়তান বলা হয় সে আসলে তোমাদের অন্তরে বিরাজ করছে। এ জন্য সময়কে তোমরা সনাক্ত করতে পারো নি। আকাশীয় নিদর্শনাবলীকে প্রত্যক্ষ করতে পারো নি। কিন্তু তোমাদের উপর আর কি আফশোস করব, সেই সত্ত্বা যা আমার মতো মূসার পরে চৌদ্দ শত বছরে আবির্ভাব হয়েছিল দুষ্ট ইহুদীরা তার নামও দাজ্জাল রেখেছিল।*

فالقلوب تشابهت اللّٰهُمَّ ارحم.

যদি নবুয়ত লাভ হতে পারে সেক্ষেত্রে আকাশ থেকে কাউকে অবতরণ করা হল প্রকৃত অধিকার প্রাপ্যের অধিকারকে বিনষ্ট করা। আর কোন উম্মতিকে আশিসপ্রাপ্ত করতে কিই বা প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে যাতে মোহাম্মদী আশিসের দৃষ্টান্ত কারোর উপর সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায়? কারণ নবীকে নবী তৈরী করার কোন অর্থ হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি সোনা বানানোর দাবী করে আর সোনার উপরেই একটি রাসায়নিক কিছু রেখে বলে যে, দেখো সোনা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হবে যে সে সত্যই একজন সোনা প্রস্তুতকারক? সুতরাং আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণরাজির পরিপূর্ণতা তো তার মধ্যে ছিলই না যা একজন উম্মতির মধ্যে শ্রেণীগত প্রচেষ্টার অনুসরণের কারণে তৈরী হয়েছে নয়ত একজন নবীকে পুনরায় নবী সাব্যস্ত করা যিনি পূর্ব হতেই নবী বলে আখ্যায়িত তাকে উম্মতি নির্ধারণ করা আর তার পর এ খেয়াল করা যে, তাকে নবুয়তের যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র উম্মতি হওয়ার কারণে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নয়, কি ভয়ংকর মিথ্যা। বরং বাস্তবিকই এ দুটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। কেননা, হযরত মসীহের নবুয়তের বাস্তবতা হল সে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণ ব্যতীত সরাসরি নবুয়তের মর্যাদা লাভ করেছে। এর পর যদি হযরত ঈসাকে উম্মতি বানানো হয় যেমনটা হাদীস **ইমামাকুম মিনকুম** থেকে প্রতিপন্ন হয় সেক্ষেত্রে এর অর্থ এটা দাঁড়াবে যে তার প্রত্যেকটা পুরস্কার মোহাম্মদী নবুয়ত থেকে প্রাপ্ত। আর এখনই আমরা স্বীকার করে আসলাম যে তার নবুয়তের পরিপূর্ণতা মোহাম্মদী নবুয়তের জ্যোতিতে পূর্ণতা

লাভ করেনি। আর এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে এখানে পরিত্যাগ করতে হবে। যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে উম্মতি বলা হয় অথচ মোহাম্মদী নবুয়ত থেকে সে কোন কল্যাণ লাভ করে নি তাই উম্মতি হওয়ার বাস্তবতা তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। কেননা, এই মাত্র আমি উল্লেখ করেছি যে, উম্মতি হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র এটাই যে, সব ধরণের পরিপূর্ণতা যেন আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ হয়, যেমনটা কোরআন করীমের জায়গায় জায়গায় এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান। আর যখন একজন উম্মতির জন্য তার অনুসরণীয় নবীর আশিস লাভের দরজা উন্মুক্ত হয়ে আছে সেক্ষেত্রে একটি কৃত্রিম পথ অবলম্বন করা এবং পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে বৈধ সাব্যস্ত করা কতটা মূর্খামির পরিচয়। আর সেই ব্যক্তি উম্মতিই বা কিরূপে হতে পারে, যার কোন বৈশিষ্ট্যই আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ হয়নি। এখানে কিছু অজ্ঞদের এই আপত্তির খণ্ডন হয়ে যায় যে খোদাতা'লার পক্ষ থেকে ঐশী বাণী লাভের জন্য এটা অনিবার্য যে সেই ওহী যেন আরবীতে না হয়ে আপন ভাষাতেই হয় । কেননা, আপন মাতৃভাষা সেই ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক যে স্থায়ীভাবে মোহাম্মদী নবুয়তের দ্বীপশিখা থেকে লাভবান হওয়া ব্যতিরেকে নবুয়তের দাবী করে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি একজন উম্মতিরূপে মোহাম্মদী নবুয়তের কল্যাণ অর্জন করে সে ঐশী বার্তালাপে তার অনুসরণীয়ের ভাষাতেই ওহী লাভ করতে থাকে। যাতে মান্যকারী এবং যাকে মান্য করা হয়েছে তাদের মধ্যে একই লক্ষণাবলী পরিদৃষ্ট হয়। যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রমাণ করে। আফসোস যে এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর সবরকম

অত্যাচার চালিয়েছে। প্রথমত, অভিশাপের আরোপের ফায়সালা না করেই তাঁর পার্থিব শরীরকে আকাশে উত্তোলন করেছে, যার ফলে তাঁর উপর ইহুদীদের মূল আরোপ অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, কোরআনে তাঁর মৃত্যুর কোথাও উল্লেখ নেই অর্থাৎ তার ঈশ্বরত্বের একটা কারণ তৈরী করেছে। তৃতীয়ত, অসফল অবস্থায় তাঁকে আকাশের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। যে নবীর এখনও ১২ জন হাওয়ারী (সাহাবী)ও পৃথিবীতে অবশিষ্ট ছিল না আর যার প্রচারকাজ অসম্পূর্ণ তাকে আকাশে টেনে নিয়ে যাওয়া তার জন্য নরকতুল্য। কেননা তাঁর আত্মা তবলীগি কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ করতে চায়। অথচ তাঁর ইচ্ছা বিরুদ্ধ তাঁকে আসমানে বসিয়ে দেওয়া হয়। আমি আমার নিজের দিকে দেখি যে নিজের কাজকে সম্পূর্ণ না করে যদি আমাকে শাশ্বত আকাশে উত্তোলন করা হয় আর যদি আমাকে সপ্তম আকাশেও পৌঁছে দেওয়া হয় তথাপিও আমি এতে খুশি হব না। কেননা আমার কাজই যখন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমি খুশি হবই বা কি করে। সেরকমই তিনিও আকাশে গিয়ে খুশি হননি। গোপনীয় একটা হিজরত ছিল, অজ্ঞেরা যাকে আকাশ সাব্যস্ত করেছে। খোদা সুমতি দান করুন।

والسلام علیٰ من اتبع الھدیٰ

যে ব্যক্তি সত্য পথনির্দেশনাকে অনুসরণ করে
তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

বিজ্ঞাপনদাতা: মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী
২৭ শে নভেম্বর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ।